Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.43-54
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দেশভাগ ও নদীকথা: একুশ শতকের নির্বাচিত নদী-নির্ভর বাংলা উপন্যাস

সুধাময় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Rivers have always been more than mere geographical features; they are lifelines that shape the cultural, social, and emotional landscapes of communities. For the people living by rivers, their homeland encompasses not just the land but the flowing waters that sustain and nurture them. These rivers are integral to their daily lives, serving as sources of sustenance, transportation, and spiritual significance. The Partition of India in 1947, however, severed many of these riverine communities from their beloved rivers, often transforming these waterways into borders or symbols of displacement. This monumental event not only disrupted lives but also redefined the relationship between people and their environment.

This research paper, "Partition and River Stories: Selected River-based Bengali Novels of the 21st Century," delves into the intricate connection between partition and riverine communities. It examines how partition influenced the role, position, and people's longing for the river, as vividly depicted in novels like Abdul Mannan Syed's 'Ichhamatir epar-oper', Ranabir Purkayastha's 'Surama Gangar Pani', Tanvir Mokkammel's 'Kirtinasha' and Syed Shamsul Haq's 'Nodi Karo Noy'. Through these literary works, the paper explores the profound impact of partition on the cultural and emotional landscape of those who lived by the rivers, highlighting their enduring bond with these waterways despite the upheavals of history.

Key Words: Partition, River, Border, Nationalism, Identity, Dislocation.

''তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?''
('খুকু ও খোকা'/ অন্নদাশঙ্কর রায়)

'বুড়ো খোকা'দের এই 'ভারত ভাঙা'র ইতিহাসটি সাতাত্তর বছরের অতীত। কিন্তু কিছু ইতিহাস, যা মানুষের জীবনকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের মুখে দাঁড়

করিয়ে দেয়, পাল্টে দেয় একটা গোটা দেশের মানচিত্র, সেই ইতিহাস মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। বিশেষ করে যারা সেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী, যাদের জীবন সেই ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে আলোড়িত, তাদের কাছে তা কিংবদন্তি স্মৃতি হয়েই থেকে যায়। এমনকি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শ্রুতিবাক্যের মতো প্রবাহিত হয়ে চলে। পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিসরে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ইতিহাস বা দেশভাগ এমনই একটি ঘটনা — যার পরিণতি 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'-এর মতো আজও আমাদের মনকে জিজ্ঞাসার আলোড়নে শতধাবিভক্ত করে তোলে। তাই নতুন করে ইতিহাস রচনায় ব্রতী ঐতিহাসিকদের এবং গবেষকদের মূল অ্যাজেন্ডা হিসেবে পুনঃপুন উঠে আসে ভারতবর্ষের এই দ্বিধাবিভক্তের ইতিহাস — নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

বিশ্ব ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা দেখতে পাই, দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে পুঁজিবাদী শক্তিগুলি কীভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। যাদের সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্যবাদের ফলস্বরূপ গোটা বিশ্ব দুটি পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং দুটি দলই চায় বিশ্বের অনুন্নত ও ছোটো ছোটো দেশগুলিকে নিজেদের অধিকারে রাখতে। ফ্যাসিস্টশক্তি ও মিত্রশক্তির এই প্রতিদ্বন্দ্বীমুখিন আগ্রাসন অনিবার্যভাবে ১৯৩৯ সালে সমগ্র বিশ্বকে এক ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রভুত্ববাদী শক্তিগুলির 'মাৎস্যন্যায়' নীতি একদিকে যেমন অনেক দেশের স্বাধীনতা হরণ করে, তেমনি অনেক ভূখণ্ডকে দ্বিধাবিভক্তও করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তঝরা পরিণতির পর শান্তি-সমঝোতার এক বাতাবরণ তৈরি করা হলেও সাম্রাজ্যবাদ বা আধিপত্যবাদের কি সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে? — এই জিজ্ঞাসা আজও আমাদের মনে জেগে ওঠে জার্মানির ইহুদি নিধন, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধ, কোরিয়া-ভিয়েতনামের ইতিহাস চিন্তা থেকে শুরু করে এই শতকে ঘটে যাওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বা আজারবাইজান-আর্মেনিয়া দ্বন্দ্ব কিংবা তালিবান কর্তৃক আফগানিস্তান অধিকারের মতো একাধিক রাজনৈতিক ঘটনায়। যার ফলে নাজেহাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাদেরকে নির্বাসিত হতে হয় কিংবা নিজভূমে পরবাসীর মতো কাটাতে হয় জীবন।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বহুসমালোচিত অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বস্তুতপক্ষে ১৯৪৭ সাল ও তার পূর্বাপর ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা যা ভারতের রাজনীতিকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছিল। ১৯০৫ সালে যে জাতীয়তাবাদ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিল, সেই জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় পুষ্ট হয়ে হিন্দু-মুসলিম দুটি পৃথক জাতিতে পরিণত হল। ১৯০৬ সালে ঢাকায় জন্ম নিল মুসলিম লিগ — মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে। ১৯১৩ সালে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে মহম্মদ আলী জিন্না লিগে যোগদান করলেন এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার শুরু করলেন, যা শেষপর্যন্ত ১৯৪০ সালে লিগের লাহোর অধিবেশনে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত হয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপ ধারণ করলো। ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে লিগ কর্তৃক ডিরেক্ট অ্যাকশেনের ফলস্বরূপ কলকাতায় ঘটে গেল এক ভয়াবহ দাঙ্গা, যা 'দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে ইতিহাসে পরিচিত। অনেকের মতে লিগের এই পাকিস্তান প্রস্তাব বা জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব দেশবিভাগকে অবধারিত করে তুলেছিল আর তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। একজন রাজনীতিবিদের মতে —

> সুতরাং মুসলিম লীগের দাবির কাছে শ্রমিক দলের নতি স্বীকারের অর্থ, আমার মতে, মুসলিম লীগকে খুশি করবার জন্য নয়, আসলে এটা ইংরেজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই করা হয়েছিল।[১]

অতএব এটলি সরকারের স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মাউন্টব্যাটেনের চতুরতাপূর্ণ কৌশলে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশদুটি বিভক্তির মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট যথাক্রমে স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হল। দুই দেশের মহাফেজখানায় লিপিবদ্ধ হল লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করার কাহিনি, মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে উদ্বাস্তু হওয়ার কাহিনি।

কিন্তু শুধুমাত্র মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবির হঠকারিতা কিংবা ব্রিটিশ সরকারের আত্মতুষ্টিই কি দেশভাগের জন্য দায়ী? হিন্দু সংগঠনগুলির কি কোনো সক্রিয় ভূমিকা এর পিছনে কাজ করেনি? বিশেষ করে বাংলার রাজনীতিতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লিগের সরকার গঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দি হন বাংলা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, ফলে বাংলায় মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক আধিপত্য স্বাভাবিকভাবেই বিস্তার লাভ করতে শুরু করে — যা বাঙালি হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। তারা মুসলিম শাসকের অধীনে স্বাধিকার বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবকেই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করে ও সমর্থন করে। ১৯৪৬-১৯৪৭ এর মাঝামাঝি সময় থেকে হিন্দু সংগঠনগুলি যেমন হিন্দু মহাসভা, বেঙ্গল কংগ্রেস, আরএসএস এমনকি অমৃতবাজার পত্রিকা মুসলিম শাসনের নৃশংসতা ও একটি পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের প্রচার শুরু করে। একজন সমালোচক বলেছেন —

> বাঙলা ভাগের জন্য ৭৬টি জনসভার আয়োজন করা হয় বলে জানা যায় — এর মধ্যে কংগ্রেস একাই কমপক্ষে ৫৯টি জনসভার আয়োজন করে। বারোটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মহাসভার উদ্যোগে, আর মাত্র পাঁচটি জনসভা হয় যৌথ উদ্যোগে।[২]

এছাড়া সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরকার মতানৈক্য, পলিশি মেকিং ত্রুটি এবং বাংলা, বিহার, দিল্লি, পাঞ্জাব, নোয়াখালি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে ঘটে যাওয়া অমানবিক দাঙ্গাগুলি দেশভাগকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। অতএব দেশভাগ কোনো একক ব্যাক্তির প্রয়াসের ফল নয়, একাধিক রাজনৈতিক দলের ও মানুষের সম্মিলিত জোড়াতালির পরিণতি।

ভৌগোলিক দিক থেকে দেশ বলতে একটি বৃহৎ ভূখণ্ডকে বোঝালেও, সাধারণ মানুষের কাছে তার বাস্তুভিটে, পরিচিত মানুষজন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পরিচিত নদীই হল দেশ। বিশেষ করে নদীমাতৃক বাংলাদেশে (দুই বাংলা), যেখানে মহাদেবের জটার মতো বিছিয়ে আছে অজস্র নদী, সেখানে নদীর সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। মূলত নদীর উপর নির্ভর করেই নদীতীরবর্তী মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। নদী যেন সেক্ষেত্রে হয়ে ওঠে তাদের জীবনদায়িনী সঞ্জীবনী শক্তি। মানুষ এই নদীকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করে, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার করে নেয়। আবার এর ধ্বংসাত্মক প্রলয়ংকারী রূপ দেখে 'সর্বনাশী' 'পাষণ্ডী' বলে তিরস্কার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। নদীকে তারা কখনো প্রাণহীন সত্তা হিসেবে কল্পনাও করে না, নদী যেন তাদের কাছে এক মানবী প্রতীক। কিন্তু দেশভাগ এই নদী অন্তঃপ্রাণ মানুষগুলির জীবনকে করাতের আঘাতে দু-টুকরো করে দিল, বিচ্ছিন্ন করে দিল আশৈশব পরিচিত নদী থেকে। এমনকি কখনো নদীই পরিণত হল দুই দেশের কাঁটাতারে, যার একদিকে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তান অন্যদিকে পশ্চিমবাংলা তথা ভারত। আবার কখনো নদী স্বয়ং দেশভাগের দ্যোতকে পর্যবসিত হয়ে সাধের বসত-ভিটে থেকে মানুষকে সাময়িকভাবে উদ্বাস্তু জীবনকূপের অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। আসলে বন্যা, ধ্বস, নদীর পাড় ভাঙা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তো দেশ ভাঙারই নামান্তর। গৃহছাড়া সাধারণ মানুষের এই নদীস্মৃতি, জীবন-যন্ত্রণা কিংবা একটা গোটা নদীর ভৌগোলিক পটবদল কোনো ইতিহাস গ্রন্থে

মিলবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও বাংলা সাহিত্যে এর যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাংলা উপন্যাসে দেশভাগের অন্তরালে ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের স্বভূমি ও স্ব-নদীর প্রতি মর্মযন্ত্রণা প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারবার। একুশ শতকের নির্বাচিত বাংলা নদী-ভিত্তিক উপন্যাসে আমরা দেখবো যে, দেশভাগ জনিত কারণে নদীর ভূমিকা, অবস্থান এবং সাধারণ মানুষের মননে নদীর জন্য ব্যাকুলতা কীভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচিত উপন্যাসগুলি হল — আবদুল মান্নান সৈয়দের 'ইছামতীর এপার-ওপার', রণবীর পুরকায়স্থের 'সুরমা গাঙর পানি', তানভীর মোকাম্মেলের 'কীর্তিনাশা' ও সৈয়দ শামসুল হকের 'নদী কারো নয়'।

আবদুল মান্নান সৈয়দ মূলত একজন বাংলাদেশি কবি ও গবেষক। তবে উপন্যাস নামক কক্ষটিতেও তাঁর বিচরণ ছিল। লিখেছেন বেশ কিছু উপন্যাস, তার মধ্যে অন্যতম হল আমাদের আলোচ্য 'ইছামতীর এপার-ওপার' (২০১০)। উপন্যাসটিতে লেখক কোলাজের মতো টুকরো টুকরো ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুটি চরিত্র মন্টু ও মীরার কৈশোর প্রেম-বেদনা এবং দাঙ্গা ও দেশভাগ জনিত কারণে নিজ নিজ স্বদেশ ত্যাগের কাহিনি। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখবো মন্টুর নৌকা যাত্রা। কিন্তু এই যাত্রা স্বেচ্ছাকৃত নয়, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হানাহানি তাকে বাধ্য করেছে স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে। দুই দেশের সরকার কর্তৃক কর্ম বিনিময় পরিকল্পনার সুবাদে মন্টুর বাবা কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ঢাকায় চলে গেছেন সপরিবারে, শুধুমাত্র মন্টু থেকে গেছে তার দাদা-দাদির সাথে কলকাতায়। কিন্তু সেইসময় দুই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার, লুঠতরাজ, হানাহানি শুরু হয়েছিল তার শিকার হতে হয় মন্টু ও তার দাদা-দাদিকে। জাতিগতভাবে মন্টুরা ছিল মুসলমান, তাই সংখ্যালঘু হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে তাদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রক্তচক্ষুর মুখোমুখি হতে হয়। পাড়ি জমাতে হয় রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ইছামতীতে। ইছামতী পেরোলেই তারা পৌঁছে যাবে পূর্ব পাকিস্তানে দেবহাটায়। মন্টুর বাবার এক উক্তিতে তৎকালীন দাঙ্গা কবলিত মানুষের অনিশ্চিত জীবনের আভাস পাওয়া যায় —

> যখন শুনলুম', বললেন, 'তোমরা সব নৌকো করে আসছ, তারপর আর কোনো খবর নেই, ভাবলুম সব হয়তো কেটে ফেলেছে কি ডুবিয়ে মেরেছে। আর যে দেখা হবে, ভাবিনি।[৩]

পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছে মন্টুরা তৎকালীন বিনিময় প্রথার মাধ্যমে মফঃস্বলে হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি কিনে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু আর্থিক অনটন ও রিফ্যুজি হওয়ার কারণে অবমাননার শিকার হতে হয় প্রতিনিয়ত। স্কুলে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার মুখে পড়তে হয় মন্টুকে, যখন মাস্টারসাহেব বলেন —

> ও। রিফুজি। শালার যত রিফুজি ছিল এসে জুটেছে আমাদের এইখানে। জায়গা পেল না আর। ব্যস শস্তাগণ্ডার দিন শেষ। বাজারে সব জিনিস মাংগা হয়ে গেল — রাতারাতি দুনো দাম হয়ে গেল। যত সব হাভাতে।[৪]

এই মফঃস্বলে থাকাকালীন মন্টুর সাথে পরিচয় ঘটে মীরা নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যার ও তার পরিবারের। যারা পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত এবং যাদের জীবন অভাবের বেশ্যাবৃত্তির কাছে বিক্রীত। এই মীরার সাথে মন্টুর পূর্বরাগের একটা আভাস লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন ঠিকই কিন্তু সেই পূর্বরাগ অভিসারে পর্যবসিত হওয়ার কোনো সুযোগ পায়নি। কেননা তার আগেই মীরাদের চলে যেতে হয়েছে অকথিতভাবে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য দেশে। লেখক সেকথা না বললেও আমরা অনুমান করতে পারি যে, মন্টুরা যেমন ইছামতী

পেরিয়ে চলে এসেছিল পাকিস্তানে, মীরারাও ঠিক একই কারণে ইছামতী অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল ভারতে।

উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন দাঙ্গা দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ আছে তেমনি অন্যদিকে আছে দুই অসম সম্প্রদায়ের নরনারীর প্রেমের বিপন্নতা। নদী ইছামতীরও একটা লক্ষণীয় ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইছামতী যেন শুধুমাত্র একটি নদী নয়, যেন মানচিত্রে টানা র‍্যাডক্লিফের লাল পেন্সিলের দাগ — যার একপ্রান্তে হিন্দুস্তান অপরপ্রান্তে পাকিস্তান। যে ইছামতী একদা অখণ্ড ভারতবর্ষের পরিচয় বহন করতো, সেই ইছামতী দুই দেশের সীমান্ত সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ল। দেশভাগ মানুষের সাথে সাথে নদীকেও যেন করে তুলেছে রিফ্যুজি। ইছামতী এখানে সেই সমস্ত নদীরই প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

দেশভাগ শুধু যে সমাজের এলিট শ্রেণির ভাগ্য বিপর্যয়কেই বিশেষভাবে আলোকিত করে তা নয়, তাদের ছায়াসঙ্গী হয়ে যেসমস্ত নিম্নবর্গীয় ও অন্ত্যজ গোষ্ঠীর মানুষেরা শ্যাওলার মতো ভেসে যায়, তাদের অনিকেত জীবনের বাঁকগুলিকেও আতস কাঁচের আওতায় নিয়ে আসে। রণবীর পুরকায়স্থের 'সুরমা গাঙর পানি' (২০১২) দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে নির্মিত নিম্নবৃত্ত মানুষের জীবন সংকটেরই দলিল। লেখক রণবীর পুরকায়স্থের জন্ম আসামের বরাক উপত্যকায় — ছিটমহলে। কিন্তু তাঁর পিতৃ-পুরুষের আদি বাস তথা স্বদেশ ছিল সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ, দেশভাগের সময় যা পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখক নিজের চোখে দেশভাগ না দেখলেও; স্বদেশ ত্যাগের সমসাময়িক অভিজ্ঞতা না থাকলেও, ভিটেমাটির প্রতি টান তাঁর রক্তের ভিতরে অনুভূত হয়েছে প্রতিনিয়তই। লেখক আলোচ্য উপন্যাসের 'কথার কথা' অংশে বলেছেন—

> মোহনা থেকে উৎসে ফিরে যাওয়া যায় না। জল কি উজানে বইতে পারে? তবু অন্তর্গত রক্তের কল্লোলে কী যেন এক ইচ্ছা জেগে থাকে। উৎসে বড় মায়া। সেই মায়াবী পর্দাকে ছুঁতে সাধ যায়। কোন্ সব-পেয়েছির দেশ সেখানে? কোন্ এলডোরাডো![৫]

তাই লেখক পৌঁছে যান শিকড়ের খোঁজে, স্বদেশের জল-হাওয়ায় আবিষ্কার করেন আখ্যানের বীজ, মনের গহনে জেগে ওঠে বৈতল নামের চরিত্র। যার ভাসমান জীবন এই উপন্যাসের উপজীব্য।

সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ পরগনায় বইয়াখাউড়ি গ্রামে কৈবর্ত পরিবারে বৈতলের জন্ম। যাদের একমাত্র পেশা মাছ মারা। বৈতল তাই নিজেকে 'পানির পুত' বলে জিগির করে। সুনামগঞ্জের সুনাম, সুরম্য অলংকার সুরমা নদী। জল-হাওয়ের দেশ এই সুনামগঞ্জ। বন্যা তার একমাত্র দুঃখ হলেও বৈতলের ভয়-ডর নেয়। বাপ বলেছে 'হেই বৈতল, পানিত লাম' নেমে গেছে জলে, খলুই থেকে আলদের বাচ্চা তুলে ফেলে দিয়েছে। বৈতলের প্রাণের বন্ধু রুল আমিন বেজ ওরফে লুলা হয়েছে তার ভ্রাম্যমান জীবনের দোসর। দুজনের ধর্ম আলাদা হলেও, ধর্মের ভেদাভেদ এই দুটি কিশোর প্রাণকে স্পর্শ করতে পারেনি। তারা যেন 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম' বা বৈতলের মায়ের কথায় 'রাম রহিম'। আখড়ায় কিংবা মাজারে, মন্দিরে কিংবা মসজিদে তারা অনাহূত রবাহূতের মতো নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে লুলার আত্মদর্শন —

> মাইনষর গাত লেখা থাকে না ইন্দু বাঙাল। ইতা মাইনষে বানায়।[৬]

বন্ধু লুলা আর গুরু সৃষ্টিধর ওঝার সান্নিধ্যে বৈতল জেনেছে জীবন সম্পর্কিত অনেক তত্ত্বকথা, দেশ ও দেশভাগের গূঢ় জটিল রহস্য। 'দেশ কিতা' — বৈতলের এই কৌতূহলের জবাবে গুরু সৃষ্টিধর ওঝা বলেছেন —

> দেশ হইল, বুঝছনি, এক ঝাণ্ডা। বদমাশির জয়পতাকা। দেখিয়া ডরাইতা।...অখন দেশ অইল মন্দির আর মসজিদ। হিন্দুর আর মুসলমানর জোর যার দেশ তার।[৭]

দেশভাগ বৈতলের জীবনকে, তার স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, করে তুলেছে তাকে এক ভাসমান পথের পথিক। যে বৈতল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল দেশ ছেড়ে না যাবার সংকল্পে, সেই অটুট সিদ্ধান্তও সে শেষপর্যন্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। গুরু জৈন্তিয়ার পাহাড় থেকে বরাক নদীর এক সূক্ষ্ম জলরেখা দেখিয়ে বৈতলকে বলেছিলেন —

> তেড়া ভেড়া এইন সৎ মা। আপন মা নায়, যাইও না সুরমা মারে ছাড়িয়া।[৮]

দেশভাগ তাকে আপন মাতৃসমা সুরমা নদী থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সময় ও পরিস্থিতি সবকিছুকে কেমন জানি বদলে দেয়, মুনির মনও টলে যায় এই দুইয়ের সংমিশ্রিত অভিঘাতে। সিলেটের গণভোটে পাকিস্তান পন্থী কুড়াল চিহ্নের বিজয় গৌরবে বন্ধু লুলাও পাল্টে যায়। তার মাথাতেও প্রবেশ করে কায়েদে আজমের দ্বিজাতি মন্ত্র। ইসলামের চাঁদ-তারা পতাকা তলে সেও ভিড়ে যায় সাম্প্রদায়িকতার মায়াজালে। পরিস্থিতি চূড়ান্ত হয়ে ওঠে যখন সে মালীভিটায় হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা দুর্গাবতীকে কামোদ্দীপক লোলুপ মানসিকতায় আক্রমণ করে। বৈতল বাধ্য হয় আশৈশব সঙ্গী লুলাকে মারতে, পিয়াইনের স্রোতে তার লাশ ভাসিয়ে দিয়ে বলে 'পবিত্রোপবিত্রবা'। সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতের অন্ধকারে দুর্গাবতীর হাত ধরে বৈতল পাড়ি দেয় কোনো এক সব না জানার দেশে।

বৈতল সুরমার উজানি স্রোত বেয়ে পৌঁছে যায় আসামের কাছাড় জেলায় — নতুন দেশ ইন্ডিয়ায়। গণভোটে সিলেট পাকিস্তানের ভাগে পড়ায়, তা এখন বৈতলের কাছে ভিনদেশ। তাই তাকে নির্বাসিত হতে হয় 'সৎ-মা' বরাক নদীর দেশে। মধুরামুখের হেডমাস্টার বৈতলকে ভূগোলের পাঠ দিতে গিয়ে বলেছেন —

> অউ যে তুমি রিফুজি অইয়া ইপারো আইছো, ইতা ভুগল নায়। ইতা বানাইল ভুগল। ইতা ভুল ভুগল। ইতা না মানলেউ সুখ।[৯]

বৈতল তাই মানেনি ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এই কৃত্রিম ভূগোলের অনাচার। ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে উঠে সে নতুন করে ঘর বাঁধে স্ত্রী দুর্গাবতী ও কন্যা মরণির টানে। বন্ধু লুলা ও গুরু সৃষ্টিধর ওঝার অভাব পূরণ করে নেয় দুঃখু, আপদ, বছই এর সমপ্রাণতায় ও মামু পীরের সান্নিধ্যরসে। কিন্তু তবুও বৈতল মুক্তি পায়নি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাত থেকে। উদ্বাস্তু হওয়ার যে যন্ত্রণা তার অভিব্যক্তি আছে বৈতলের উক্তিতে —

> হিনর বাঙাল হকলে কয় বাপর দেশো যা, আইলাম। ইনর হিন্দুয়ে বাঙালে কয় রিফ্যুজি। রিফ্যুজি কিতা হিন্দু মুসলমান না খেদাখাওয়া হকলর নতুন ধর্ম। অখন যে কইরা যাইতাম আবার, গেলে মায় নিবা নি।[১০]

অতীত স্মৃতি যেন 'আয় আয়' বলে বৈতলকে হাতছানি দেয় প্রতিমুহূর্তেই। তার ইচ্ছে করে 'এক বুড়ে' (এক ডুবে) গিয়ে ওঠে সুরমা পিয়াইনের তীরে। সিলেটের সেই সুরমা, যাকে হিন্দুরা দেখে 'সুন্দরী বেটির লাখান' আর মুসলমানরা বলে 'চউখর কাজল, সুমা'। বৈতল ভেবে পায় না জলের সঙ্গে দেশের শত্রুতার

কারণ, দেশের অনুকারী হিসেবে জলকেও কেন ভাগ করা হয়েছে, সীমান্ত পুলিশ উপর থেকে কীভাবে মাপবে সেই জলের গভীরতা। এখানকার মানুষের মুখে বরাক নদীর প্রশংসা শুনলেই তাই তার মন আপনা থেকে ভেসে গেছে সুরমার নস্টালজিয়ায়। যে সুরমাকে সে আশৈশব জেনে এসেছে নিজের নদী বলে, সিলেট সুনামগঞ্জের আপন নদী বলে। সেই সুরমা এখন শুধুমাত্র অতীত স্মৃতি হয়ে বৈতলের চেতন অবচেতন মনের মধ্যপথে প্রবাহিত।

নতুন দেশে এসে বৈতল একদিকে যেমন কিছু আনকোরা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তেমনি দেখেছে অতীত অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি। লিগ-কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা দেশ ও দেশের মাটি নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারার রাজনীতি। শুনেছে 'সিলেট নিলাম ভোটর জোরে, কাছাড় নিমু লাঠির চোটে' স্লোগান, দেখেছে জমিদার যমুনাপ্রসাদের দলবদলের ভণ্ডামি, মুসলমান তাড়ানোর কারসাজি। মেহেরপুর ক্যাম্পের বিষন্ন জীবন অতিবাহিত করে বৈতল আশ্রয় নিয়েছিল এই যমুনাপ্রসাদের পুকুরপাড়ে পরিত্যক্ত টিনের কুঁড়ে ঘরে। আসলে বৈতল যেমন রাজনীতির ঘেরাটোপের বাইরে বাঁচতে চেয়েছে, তেমনি তার পথের কাঁটাকে সাফ করে দিতেও সে সংকোচবোধ করেনি। লুলা ও যমুনাপ্রসাদের মৃত্যু সেই ঘটনারই প্রমাণ দেয়। সাম্প্রদায়িক হানাহানি তাকে একমুহূর্তের জন্য শান্তি দেয়নি। প্রবাসেও তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে দাঙ্গার, প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপ দিতে হয়েছে 'পানিকিতাব' জানা বৈতলকে বরাক নদীতে। যে দাঙ্গা তাকে স্বদেশ ছাড়া করেছিল, সেই একই দাঙ্গা তাকে প্রবাস ছাড়া করেছে। গুরু সৃষ্টিধর বলতেন —

> সব নদী অউ সাগরো যায়। সব নদী অউ মানুষর মতো, খালি আউগ্‌গায়। থামে না, শেষে গিয়া ঝপ করিয়া সাগরো পড়ে। অই অইল মৃত্যু। মৃত্যু কিন্তু শেষ নায় রেবা, আবার এক আরম্ভর লাগি সাজিয়া গুজিয়া বই থাকা।[১১]

বৈতলের জীবনও নদীর মতো উৎস থেকে সাগরের দিকে ধাবিত হয়েছে — হয়তো মৃত্যু কিংবা মৃত্যু পরবর্তী কোনো এক আরম্ভের সম্ভাবনায়।

মনুষ্যসৃষ্ট দাঙ্গা ও দেশভাগের কৃত্রিম রাজনীতি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ঐক্যমূলে আঘাত হেনেছে। পরিণতিতে বৈতলের মতো নদীঘেঁষা সাধারণ মানুষের জীবন হয়েছে অচল। আপন ভিটেমাটি আপন নদী থেকে চিরদিনের জন্য হতে হয়েছে নির্বাসিত। 'সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!' — প্রবাসী মনে উদ্বেলিত হয়েছে এই ব্যাকুল প্রতিধ্বনি। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে মাতৃভূমি ও মাতৃসুলভ নদীকে ফিরে পাওয়ার ঐকান্তিক বাসনা ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

দেশভাগ ও নদী-নির্ভর আখ্যানের ধারায় সংযোজিত হয়েছে এই শতকের একজন সমাজমনস্ক ও ইতিহাস সচেতন লেখক তানভীর মোকাম্মেলের 'কীর্তিনাশা' (২০১৬) উপন্যাসটি। সাতচল্লিশের দেশভাগ নাকি কীর্তিনাশা পদ্মার আগ্রাসন — কে বেশি ক্ষতি করল বিক্রমপুর জনপদের, লেখক সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন উক্ত উপন্যাসে। তৎকালীন বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক অঞ্চল বিক্রমপুর, যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশে। কিন্তু কালক্রমে কীর্তিনাশা পদ্মার ক্রমভাঙন বদলে দিয়েছে বিক্রমপুরের মানচিত্র, তার সামাজিক অবস্থান। তবে এ জনপদের মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি সংকট ঘনিয়ে এসেছে স্বাধীনতা পূর্ব দেশভাগের পরিকল্পনায়। দেশভাগ ও পদ্মার ভাঙন কীভাবে একটি সমৃদ্ধ লোকালয়ের

সৌভাগ্যকে বিপর্যয়ের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়, সেই তথ্যপূর্ণ কাহিনি মানবিক রসে ফুটে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসে।

'যে দেশে ডাকে ডাহুক/ সে দেশে থাকে না লোক' — সুহাস ও সোহরাব দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের কৈশোরিক বন্ধুত্বে এবং সেই আত্মিক সম্পর্কের বিচ্ছেদে এই প্রবাদ বাক্যটিই যেন রূঢ় বাস্তবিক সত্যে পরিণত হয়েছে। বিক্রমপুর জনপদের আড়িয়াল বিলের পাশে সাতগাঁও গ্রাম। সেই গ্রামের স্কুলশিক্ষক কালিকাপ্রসাদ দত্ত ও পরিশ্রমী কৃষক শামসু মিয়া তাদের পুত্র যথাক্রমে সুহাস ও সোহরাবের মধ্যে মিতালি গড়ে তুলেছিলেন বজ্র-বৃষ্টিঝরা এক বিকেলে। হিন্দু-মুসলিম দুই পরিবারের এই আনুষ্ঠানিক আন্তঃসম্পর্কের একটি কারণ কালিকাপ্রসাদের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। আসলে নব উদ্ভূত পাকিস্তান রাষ্ট্রে কালিকাপ্রসাদ নিজের ভিটেমাটি ও স্বদেশ ছাড়ার অনভিপ্রায়কে অটুট রাখতে চেয়েছিলেন এই হৃদ্যতার মাধ্যমে। দেশভাগের প্রারম্ভে সমূহ বিপদের আশঙ্কায় বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে শয়ে শয়ে হিন্দু পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। যে বিক্রমপুর ছিল একদা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানকার স্কুল-কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে বিক্রমপুরের পূর্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে ভাঁটা পড়ে। ভাগ্যকূলের শেষ জমিদারের বিদায় দৃশ্য তাই বিয়োগান্তিক হয়ে ওঠে এলাকার মানুষের কাছে। কিন্তু শুধু ভাগ্যকূলের জমিদারই নয়, এরপরও অসংখ্য মানুষ গড্ডলিকা প্রবাহের মতো চলে গেছে বাস্তুহারা হয়ে। পাকিস্তান আন্দোলনের দাবিতে তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের এতটায় মশগুল করে তোলা হয়েছিল যে, তাদের বিচার-বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কর্তার প্রতি জনৈক এক মুসলিম প্রজার মন্তব্য তুলে ধরেছেন একজন সমালোচক —

> — কর্তা, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। মনে রেখ, আমরা আর ছোট নই। ভুলে যেও না, এখন থেকে সমানে সমানে আমাদের সঙ্গে মিতালি করতে হবে।[১২]

মুসলমান প্রজার এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মনে আতঙ্কের শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষাধিক মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

এহেন পরিস্থিতিতে সুহাসদেরও চলে যেতে হয়েছিল সাধের বিক্রমপুর ছেড়ে। সুহাসের মায়ের কণ্ঠে তাই কাতর আকুতি —

> যেতে তো চাই-না রে।...পঞ্চাশের দাঙ্গার পরেও তো যাইনি।...গাছগাছালি ঘরবাড়ি ছাইড়া কে যাইতে চাই বল্?[১৩]

বিদায় বেদনার পাশাপাশি লেখকের ইতিহাস সচেতনতারও পরিচয় পাই শ্রীনগর বাজারে আদর্শ হোমিও হলে প্রৌঢ়দের আলোচনায়। সেখানে এক একজন রাজনৈতিক দলের সমর্থক দেশভাগের দায় তুলে ধরেছে অন্যের প্রতি। কমিউনিস্টদের তোষণনীতি, মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, সুভাষ বসুর প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা, ১৯২৩ সালের চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্টের ব্যর্থতা, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে ফজলুল হকের দলবদল ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। নাথুরাম গডসে কর্তৃক গান্ধিজির হত্যার খবর শুনে শ্রীনগর স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক অবনীবাবু বলেছেন —

> ভাগ্যিস! এক হিন্দু মেরেছে। নামটা মুসলমান হইলে আমাগো অবস্থা এদেশে কী হইত, তা' বোঝো কালিকা মাস্টার![১৪]

তৎকালীন জামিন পলিশি (এক দেশে হিন্দু আক্রান্ত হলে অন্য দেশে মুসলিমদের খুন করে তার ক্ষতিপূরণ নেওয়া হত কিংবা এর উল্টোটা) দুই দেশের হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গার যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তারই আভাস ফুটে উঠেছে অবনীবাবুর উৎকণ্ঠায়।

অন্যদিকে পদ্মার ক্রম ভাঙন বিক্রমপুরবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। পদ্ম নামক মুনির আহ্বানে বা আসাম-বাংলার ভূমিকম্পে পদ্মা তার গতিপথ দক্ষিণের বদলে পূর্ব মুখে পরিবর্তন করেছিল। ফলে একাধিক জনপদ তলিয়ে গিয়েছিল তার অতল গহ্বরে। রাজা রাজবল্লভের গর্ব খর্বকারী পদ্মার আরেক নাম তাই কীর্তিনাশা। এই কীর্তিনাশা পদ্মার গতিমুখে পড়ে পাল্টে গিয়েছিল বিক্রমপুরের মানচিত্রও। একের পর এক গ্রাম তার নিজস্ব অবস্থান থেকে হারিয়ে যেতে থাকে, তলিয়ে যেতে থাকে ড্রাগনের মতো পদ্মার হাঁ-মুখে পতিত হয়ে। তাই স্কুলশিক্ষক বিভূতিবাবুর মন্তব্য —

> নদীরে একদিন মাইন্ষে ঠিকই বাইন্ধা ফেলাইব। এ তোমাদের কয়ে রাখলাম। তয় মাইন্ষে মাইন্ষে যে ভাঙ্গনডা সাতচল্লিশে ঘটল সেডা আর জোড়া লাগাইবো কেডা![১৫]

সাতচল্লিশের দেশভাগ নামক এই বিপন্নতা অন্যান্য হিন্দু পরিবারগুলোর মতো সুহাসদেরও বাধ্য করেছিল দেশত্যাগে। বন্ধু সোহরাবকে ছেড়ে একমুঠো ভিটেমাটি হয়ে উঠেছিল সুহাসের অনিশ্চিত জীবনের পাথেয়। দেশ তো মায়ের মতো 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তবু কেন মানুষকে চলে যেতে হয় এই মাতৃপ্রতিম দেশ ছেড়ে, হারাতে হয় সাড়ে তিন হাত ভূমির অধিকার — চিরন্তন এই জিজ্ঞাসা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ছিন্নমূল মানুষের হৃদকন্দরে। উপন্যাসে দেশভাগ ও নদীভাঙন একরৈখিক ভূমিকায় বিক্রমপুরের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। নদী যেন এখানে দেশভাগের রূপকে পরিণত হয়েছে। এই দু'য়ের মিথস্ক্রিয়ায় উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে এক ভিন্নধর্মী আখ্যান।

দেশভাগ ও তজ্জন্যে পর হয়ে যাওয়া একটি নদীর প্রতি মানুষের আর্ত হাহাকার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে সৈয়দ শামসুল হকের 'নদী কারো নয়' (২০১৮) উপন্যাসে। এটি লেখকের শেষ উপন্যাস। আখ্যানের বীজ লেখকের মনে উপ্ত হয়েছে জন্মস্থান কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর আবহে। দেশভাগের অনিবার্যতায় যে জন্মগ্রাম থেকে লেখক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, বাল্যবন্ধু শ্যামল ও পরিমলকে চিরকালের জন্য হারিয়েছেন। সেই বেদনাবিধুর প্রেক্ষিত হৃদয়ে ধারণ করে লেখক কল্পনা করেছেন জলেশ্বরী শহর ও তার নদী আধকোশাকে। রাষ্ট্রের বিভেদীকরণ নীতির ফলে যে আধকোশা স্থানান্তরিত হয়েছিল ভৌগোলিক সীমান্তরেখার অপর পারে। উক্ত গ্রন্থের সবিনয় নিবেদন অংশে লেখক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন—

> আমার জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ওই দেশভাগ, মাটির ওই রক্তপাত, আমি এখনো একটি ফোঁটাও তার আমার স্মৃতি থেকে ধুয়ে ফেলতে পারিনি।[১৬]

মাটিকে দু'টুকরো করার রাজনীতি সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষত নদী অন্তঃপ্রাণ মানুষের মননে যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, উপন্যাসের পরতে পরতে সেই ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে।

উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র মকবুল হোসেন বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তিনি ঢাকা থেকে জন্মশহর জলেশ্বরীতে গিয়েছেন তাঁর বাবার মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। মকবুলের যখন দুই বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা যান। মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তাঁর মা আভাসে বলেছিলেন দেশভাগের সেই উত্তাল

সময়ের গল্পকথা, তাঁর বাবার মৃত্যু কথা, আধকোশা নদীর কথা। তাঁর বাবা নাকি দেশভাগকে মেনে নিতে পারেননি, মেনে নিতে পারেননি আধকোশার 'একবার পাকিস্তানে, একবার ইণ্ডিয়ায়' স্থানান্তরকে। ফলত এই আভাসসূত্রের গাঁটছড়া খুলতে সরেজমিনে পৌঁছাতে হয়েছে মকবুলকে। সাতসয়ালি পাখির সাতটি প্রশ্ন মকবুলের অনুসন্ধানকে আরও রহস্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

জলেশ্বরীতে পৌঁছে মকবুল উঠেছেন কনট্রাক্টর সাইদুর রহমানের বাংলোবাড়িতে। যে বাংলোবাড়ির কোল ঘেঁষে বয়ে গেছে রহস্যময়ী আধকোশা নদী। নদীটি এখন বাঁধশাসিত, যৌবনগত নারীর মতো নির্জীব। কিন্তু বাংলোর বাবুর্চি আলাউদ্দিনের মুখে শুনেছেন এর পূর্বের উদ্দামতা সম্পর্কে, বছর বছর মানুষ খাওয়ার রোমহর্ষক কাহিনি। সাতচল্লিশের সেই রক্তঝরা দিনগুলি জলেশ্বরীর জনজীবনে কীরূপ টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, একাধিক চরিত্রের কথনে মকবুল সে বিষয়ে অবহিত হয়েছেন। জানতে পেরেছেন তাঁর বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। দেশভাগের কারণে আধকোশা চলে গিয়েছিল হিন্দুস্তানে, জলেশ্বরীর পাশ বরাবর আধকোশা পরিণত হয়েছিল দুই দেশের সীমান্তরেখায়। চিরপরিচিত এই নদীর পর হয়ে যাওয়া মকবুলের বাবা মইনুল হোসেন মেনে নিতে পারেননি। তাই কাছাড়ির মাঠে যখন আজাদ পাকিস্তানের চাঁদ-তারা পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে মইনুল হোসেনের মনে তখন হাহাকার —

> হাহাকার— আজ থেকে নদী তবে আর আমার নয়! এই আধকোশা এতকাল পরে তবে পর হয়ে গেল।[১৭]

আজন্ম পরিচিত জগৎ দেশভাগের ঠুনকো আঘাতে নিমেষে ভিনদেশে পরিণত হল। এই আধকোশার তীরে ঘর বেঁধে মইনুলকে আগেও হতে হয়েছিল পরাশ্রয়ী। একবার নয় দু' দু'বার আধকোশা কেড়ে নিয়েছিল তার সাধের বসতবাড়ি। তৎসত্ত্বেও তিনি রাগ-অভিমান ভুলে আধকোশাকে আপন ভেবেছেন, লড়াই করেছেন আধকোশার জন্য বন্দুকের গুলিকে উপেক্ষা করে। সেই আধকোশা পর হয়ে গেল। অবশ্য তিনদিন পর আবার আধকোশা ফিরে এসেছে পাকিস্তানে। কিন্তু —

> আধকোশা যে হিন্দুস্থানে হিন্দুর ভোগে গেইছিলো, তিন দিন বাদে যে ফিরি আসিলো, কুমারী তো না ফিরিলো![১৮]

হিন্দুস্তান যেন কুমারী আধকোশাকে রেপ করে ছেড়ে দিয়েছে। একবার যে হারিয়ে যায়, সে পুনরায় ফিরে এলেও সেই আগের মতোই কি আর ফেরে? তার কি কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না? মানসিক এই অভিঘাত মইনুলকে বাধ্য করেছে আধকোশার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে। লোকে তাঁকে বদ্ধপাগল বলে অভিহিত করলেও, নদীপ্রিয় মানুষের নদী হারানোর এই আত্মসমর্পণ অযৌক্তিক বলে আমরা মনে করতে পারি না।

মইনুল হোসেনের আত্মাহুতির পাশাপাশি নদী সম্পর্কিত বশিরের সংশয়ও প্রণিধানযোগ্য—

> আধকোশা যে উত্তর থেকে নেমে এসেছে জলেশ্বরীতে, সেই উত্তর দেশ নাকি এখন আর আমাদের নয়, এখন সেটি হিন্দুস্তান! কিন্তু পানির রঙ তো সেই একই। নদী তো ভিন্ন রঙের পানি ধরে জলেশ্বরীতে এখনো আসে নাই। সেই একই পানি। একই ঢল। একই শীতল। তবে?[১৯]

দেশ আলাদা হলেও জলের তো কোনো ধর্ম বিভাজন নেই। হিন্দুস্তানে যে জল বয়, পাকিস্তানেও সেই একই জল প্রবাহিত। দেশত্যাগের পূর্বমুহূর্তে মুকুলের মায়ের মনেও তাই আতঙ্ক ও বিস্ময় এই আধকোশা বোধহয়

আর তার নয়। আসলে দেশভাগ নদী তীরবর্তী মানুষদের মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এক অচীন বিচ্ছিন্নতাবোধে। মকবুল হোসেন জলেশ্বরীতে গিয়ে সেইসব বিচ্ছিন্নতাবোধের কাহিনি শুনেছেন, শুনেছেন দেশভাগের করাল গ্রাসে পড়ে মানুষের জীবনযন্ত্রণার কাহিনি। মানিকগঞ্জের তেওতার রাজাদের ঘোড়া মারার ও স্বদেশ ত্যাগের বৃতান্ত, ওয়াহেদ ডাক্তারের নিজেকে কিং ডিক্লেয়ার, সাইদুর রহমানের কবল থেকে কুসুমির ভিটেমাটি ও সম্পত্তি রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা উপন্যাসের নিগূঢ় গ্রন্থনে তথ্যবহুল উপাদানে পরিণত হয়েছে।

দেশভাগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে বহু বিতর্কিত একটি বিষয় হিসেবেই থেকে যাবে, কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ ঘটবে। তবে এর উপসংহার টানতে গিয়ে সকলেই একজায়গায় এসে মিলিত হবেন, আর সেই মিলনক্ষেত্রটি হল ছিন্নমূল মানুষের হৃদয়পট। যে হৃদয়পটের অবচেতন স্তরে দেশ হারানোর, স্বজন হারানোর, নদী হারানোর স্মৃতি উপচে উঠবে। বস্তুত আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখেছি, দেশভাগ ও নদীর প্লাবন তথা নদী-ভাঙন কীভাবে মানুষের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, আবার দেশভাগের কারণে নদী কীভাবে দুই রাষ্ট্রের সীমান্তরেখায় পর্যবসিত হয় কিংবা চিরচেনা নদী ছেড়ে চলে যেতে হয় মানুষকে চিরতরে; যা রয়ে যায় অবচেতনায় হিমায়িত হয়ে:

> ‘সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!
> সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
> সতত...’

তথ্যসূত্র:

১. আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম। *ভারত স্বাধীন হলো*। অনু. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: পত্রপুট, ১৩৬৬, পৃ. ২৭৫।
২. চ্যাটার্জী, জয়া। *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*। অনু. আবু জাফর। সম্পা. বদিউদ্দিন নাজির। কলকাতা: এল্ অ্যাল্মা পাব্লিকেশনস, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৮।
৩. সৈয়দ, আবদুল মান্নান। *ইছামতীর এপার-ওপার*। ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১০, পৃ. ৩২।
৪. তদেব, পৃ. ৩৭।
৫. পুরকায়স্থ, রণবীর। *সুরমা গাঙর পানি*। কলকাতা: একুশ শতক, ২০১২।
৬. তদেব, পৃ. ২৭।
৭. তদেব, পৃ. ৪০।
৮. তদেব, পৃ. ৭২।
৯. তদেব, পৃ. ৯৭।
১০. তদেব, পৃ. ২১০।
১১. তদেব, পৃ. ১২৩।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণ্ময়। *উদ্বাস্তু*। কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ্, অগাস্ট ১৯৬০, পৃ. ১৫।
১৩. মোকাম্মেল, তানভীর। *কীর্তিনাশা*। ঢাকা: অনার্য, ২০১৬, পৃ. ৭৪।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৩।

১৫. তদেব, পৃ. ৭১।
১৬. হক, সৈয়দ শামসুল। *নদী কারো নয়*। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৮।
১৭. তদেব, পৃ. ১৫২।
১৮. তদেব, পৃ. ২০২।
১৯. তদেব, পৃ. ২৫১-২৫২।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:
১. পুরকায়স্থ, রণবীর। *সুরমা গাঙর পানি*। কলকাতা: একুশ শতক, ২০১২।
২. মোকাম্মেল, তানভীর। *কীর্তিনাশা*। ঢাকা: অনার্য, ২০১৬।
৩. সৈয়দ, আবদুল মান্নান। *ইছামতীর এপার-ওপার*। ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১০।
৪. হক, সৈয়দ শামসুল। *নদী কারো নয়*। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৮।

সহায়ক গ্রন্থ:
১. আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম। *ভারত স্বাধীন হলো*। অনু. সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: পত্রপুট, ১৩৬৬।
২. চ্যাটার্জী, জয়া। *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*। অনু. আবু জাফর। সম্পা. বদিউদ্দিন নাজির। কলকাতা: এল্ অ্যাল্মা পাব্লিকেশনস, ১৯৯৯।
৩. দাশ, উদয়চাঁদ। সম্পাদক। *দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান*। কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০২২।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর: আধুনিক ভারতের ইতিহাস।* অনু. কৃষ্ণেন্দু রায়। হায়দ্রাবাদ: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৯।
৫. বিশ্বাস, অশোক। বাংলা সাহিত্যে নদী: বিষয় ও রূপবৈচিত্র্য। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
৬. বিকুল, বাকী বিল্লাহ। *বাংলা উপন্যাসে নদী: সমাজ ও শ্রমজীবী মানুষ*। ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।